তপশিলী ও মৎস্যজীবী জাতির বিশেষ বিশেষ সামাজিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান

টুম্পা মণ্ডল

বাংলায় সকল শ্রেণীর মৎস্যজীবী ও মাঝিদের এক সাধারণ নাম "জেলে"। শব্দটির উৎপত্তি 'জল' বা জাল থেকে (এক ধরনের সুতো দিয়ে তৈরী জালিকাবিশেষ)। প্রকৃতপক্ষে এটি সম্প্রদায়ের নাম নয়। তাই মালো, তিয়র, কৈবর্ত, বাউর, বাগদী, রাজবংশী, এবং মুসলমানদের মধ্যে যারা ঐ বৃত্তি গ্রহণ করে এবং 'নিকিরী' সম্প্রদায়কেও জেলে বলে চিহ্নিত করা হয়।

সম্ভবত জালিয়া বা জেলে মালোদেরই মত মৎস্যজীবী এবং ধ্বনতাত্ত্বিক দিক থেকে সমীভবনে ও অল্পপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণে পরিণত হয়েছে ঝালো-মালোতে— যা সরকারী নির্দেশিত 'তপশিলী জাতি'র' অন্তর্গত। (১) তপশিলী জাতির মানুষদের মধ্যে বিভিন্ন আচার ব্যবহার ও উৎসব -অনুষ্ঠানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যা তারা নিজেদের মতো করে পালন করে থাকে। এই আলোচনায় সেই রকমই বিশেষ বিশেষ কিছু আচার অনুষ্ঠারে উল্লেখ করা হল—

ষষ্ঠীপূজো ঃ শিশুর জন্মের পর ২১ দিরে দিন এই অনুষ্ঠান পালন করা হয়। মাঝের এই দিনগুলিতে শিশুর পরিবার অশৌচ পালন করে। ষষ্ঠিপূজোর পর ব্রাহ্মন-নাপিতদের কাজকর্ম মিটলে তারপর আবার স্বাভাবিক জীবন যাপন শুরু হয়। এই অনুষ্ঠান পুত্র বা কন্যা উভয় সন্তানের জন্যই পালন করা হয়।

মুখে ভাত ঃ

শিশুর জন্মের ১৮০ দিনের মধ্যে এই অনুষ্ঠান হয়। এই সামাজিক কাজে শিশুর পিতাকে নানীমুখ অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্য জল প্রদান করতে হয়। বলা হয় এই কাজের মাধ্যমে নবজাতক পূর্বপুরুষদের আর্শীবাদ লাভ করে। এই অনুষ্ঠান তপশিলী সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে খুবই চর্চিত ও জনপ্রিয়। প্রতিটি পরিবারই নিজের সামার্থ্য অনুযায়ী এই অনুষ্ঠানে আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে এবং ভোজ খাওয়া যায়।

শিশুর মামা কিংবা দাদু শিশুর মুকে প্রথম ভাতের দানা তুলে দেয় বলেই এই অনুষ্ঠানের নাম মুখ ভাত। এটি অন্নপ্রাশন নামেও পরিচিত। নিমন্ত্রিণ আত্মীয়স্বজনে এই অনুষ্ঠানে শিশুর উদ্দেশ্যে নানা উপহার সামগ্রী প্রদান করে ও আর্শীবাদ করে।

শিশু যদি কন্যা হয় তখন জন্মের ৮-৯ মাসের মধ্যে এই অনুষ্ঠান হয়, তবে কন্যার ক্ষেত্রে নানীমুখ করা হয় না। শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়ার অনুষ্ঠান হয়।

বিবাহ বিবরণ ঃ হিন্দু বিবাহের লৌকিক যে সমস্ত আচার গুলি তপশিলী জেলেরা পালন করে থাকে সেগুলি নিম্নরূপ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিবাহের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম বা বিধি নিষেধ -এই জাতি মেনে চলে। সেগুলি হল—

১. হিন্দুদের অনেক দেবতা পূজনীয় হলেও বিবাহের ক্ষেত্রে প্রজাপতি বিবাহের দেবতা রূপে মান্য করা হয়।

২. কনে পক্ষের বাড়িতে বিবাহ সম্পন্ন হয়। উভয় পক্ষের পৃথক পুরোহিত থাকনে।

৩. পঞ্জিকা মতে লগ্ন অনুযায়ী রাতে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

৪. বিবাহে ব্রাহ্মণ নাপিতের উপস্থিতি আবশ্যক।

৫. চৈত, ভাদ্র, পৌষ এই মাসগুলিতে এবং 'মল' মাসে বিবাহ কঠোর ভাবে নিসিদ্ধ।

৬. বর কনের জন্ম মাস একই হলে বিবাহ হয় না। কনে জেষ্ঠ্য কন্যা হলে জৈষ্ঠ মাসের প্রথম পক্ষের মধ্যে বিবাহ হয় না।

৭. বর-কনের পরিবারে কোন শিশু জন্মালে, নবজাতকের ষষ্ঠীপূজো না হওয়া অবধি অশৌচ পালিত হয়। কোনরূপ বিবাহ কিংবা অন্যকোন শুভ কাজ এই সময়পর্বে হয় না।

৮. বর বা কনের পরিবারের নিকট কেউ মারা গেলে এক বছরের মধ্যে কোন বিবাহ সেই পরিবারে হয় না। এই সময় কালাশৌচ পালন করা হয়।

৯. একই গোত্রের দুই পরিবারের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

১০. বর- কনের রক্তের সম্পর্ক ও থাকা চলে না।

উপরিউক্ত নিয়মগুলি তপশিলী সমাজে কঠোর ভাবে পালিত হয়। তপশিলীজাতির বিবাহে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক আচার -অনুষ্ঠান পালিত হয় এবং তা পালন হয় কয়েক দিন ধরে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই আচার শুরু হয় "পাকা দেখা" বা "আর্শীবাদ" থেকে আর শেষ হয় "অষ্টমঙ্গলা" অনুষ্ঠানের পর। যে আচার -অনুষ্ঠান বা পর্ব গুলি পেরিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয় সেগুলি আলোচনা করা হল—

পাকা দেখা ঃ পাত্র পক্ষ ও কনে পক্ষের মধ্যে প্রাথমিক কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর পাকা কথা হয় এই পর্বে। উল্লেখ

পনপ্রথা বা বাল্যবিবাহ এই সব নিষিদ্ধ নিয়ম গুলি তপশিলী সমাজে ও মৎস্যজীবী সমাজে এখন ও বর্তমান। পাকা দেখার দিন বরপক্ষ তাদের চাহিদা জানায় এবং কনেপক্ষ সামর্থ্য মতো তা দেওয়ার অহগীকার করে এরপর গুরুজনরা নানা উপহার ও ধান, দুর্বা প্রভৃতি অর্ঘ্য সহ পাত্রকে আর্শীবাদ করে, নতুন জীবনের জন্য শুভ কামনা জানায়। অন্যদিকে পাত্রপক্ষের লোকজন ও পাত্রীকে শুভদিন ও শুভক্ষণ দেখে উপহার ও অর্ঘ্যসহযোগে পাত্রীকে আর্শীবাদ করে।

বুদ্ধিপূজা ঃ ছেলে ও মেয়ের বাড়িতে আলাদা করে এই পূজো হয়। ছেলে ও মেয়ের বাবা কিংবা বাবা না থাকলে পিতৃস্থানীয় কেউ এই পূজো করেন। সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে যার বিয়ে হচ্ছে তার সাতপুরুষের উদ্দেশ্যে এই পুজো হয়। স্বর্গত পূর্বপুরুষদের কাছে হবু কনে ও বরের জন্য আর্শীবাদ চাওয়া হয়।

গায়ে হলুদ ও তত্ত্ব ঃ বিয়ের দিন ভোরে কাঁচা হলুদ ও সরষের তেল মিশিয়ে বরের মা, দিদি, দিদিমা, বৌদি এবং আরও অনেক আত্মীয় বরকে হলুদ মাখায়, এরপর প্রতিষ্ঠিত পুকুর কিংবা গঙ্গা থেকে আনা জল দিয়ে বরকে স্নান করায়। বরের গায়ে ছোঁয়ানো সেই হলুদ এবং অনান্য তত্ত্ব সামগ্রী এরপর ছেলের বাড়ি থেকে মেয়ের বাড়ি যায়। মেয়েরা বাড়িতে সেই হলুদ দিয়ে মেয়েকে স্নান করানো হয়। এই সময় ছেলেও মেয়ে যেসব পোশাক পরে সেগুলি তাদের মামাবাড়ি থেকে আসে। উল্লেখ্য, ত্রয়োস্ত্রীরাই বর ও কণেকে হলুদ মাখায়। হলুদ মাখা শাড়ি নাপিত নিয়ে চলে যায়।

বিয়ের পোশাক ঃ

বরের পোশাক ঃ হিন্দু বাঙালী সংস্কৃতি অনুযায়ী তপশিলী সম্প্রদায়ের বিয়েতে বরকে ধুতি পাঞ্জাবী ও মাথায় টোপর পরিহিত অবস্থায় পাওয়া যায়। গলায় থাকে রজনী গন্ধার মালা, কপালে চন্দনের ফোঁটা, পায়ে কোলাপুরি জুতো। হাতে ছোট্ট পিতলের জাঁতি। বরের সাথে একই পোশাক পরে থাকে ছোট আরেকটি কোল বর। তবে বিবাহের আসরে এই পোশাক বদলে কনের বাড়ির পট্টবস্ত্র পরেই বর বিয়ের পিঁড়িতে বসে।

কনের পোশাক ঃ লাল বেনারসী শাড়িতে খুব সুন্দর করে কনেকে সাজানো হয়, আটপৌরে স্টাইলে কনেকে শারি পরানো হয়। কনের মাথায় থাকে লাল ওড়না। আর শোলার মুকুট বা পাটাসী। কপালে চন্দনের কারুকার্য, গলায় রজনীগন্ধার মালা। হাতে পিতলের কাজললতা।

বিবাহের ক্ষেত্রে যে পর্ব গুলি সম্পন্ন হয় সেগুলি হল—

সাতপাক ও শুভদৃষ্টি ঃ কনেকে বরের চারপাশে সাত বার ঘোরানো হয়। এবং বর কনে একে অপরের দিকে তাকায়।

কন্যা সম্প্রদান ঃ কন্যার বাবা কিংবা পিতৃস্থানীয় কেউ বরের হাতে কনের হাত রেখে ছোট চেলী কাপড়ে তাদের হাত বেঁধে দেন।

হোম ঃ বর, কনেকে পাশাপাশি বসিয়ে পুরোহিত আগুন জ্বেলে হোম যজ্ঞ করেন এবং মন্ত্র পড়েন।

সপ্তপদী ঃ ব্রাহ্মনের নির্দেশে বাড়ির বড় কেউ কনের শাড়ি যজ্ঞের চারদিকে সাতপাক একসঙ্গে ঘোরে। এবং ব্রাহ্মণ নির্দেশিত মন্ত্র উচ্চারণ করে।

কুসুম ডিঙা ঃ কনে কুলোয় করে যজ্ঞের আগুনে খই দেয় আর বর কনের দুটি হাত পিছন থেকে ধরে থাকে।

সিঁদুর দান ঃ সব শেষে কুনকের সাহায্যে বর কনের সিঁথিতে সিঁদুর পরায়। ও কনের মাথা একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, একে লজ্জাবস্ত্র বলে।

এভাবে বিবাহ সম্পন্ন হয়। কিন্তু বিবাহ পর্ব মেন্টে কনের শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার পর। বিবাহের পরদিন কালরাত্রি পালিত হয়। তারপরদিন সকালে ভাত কাপড়ের অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে নতুন বউ এর হাতে ভাতের থালা ও কাপড় তুলে দেয় বর। এই দিন সন্ধ্যায় নিমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়ন করে ভোজের ব্যবস্থা থাকে। এই অনুষ্ঠান বউভাত নামেই পরিচিত।

এইভাবে কয়েকদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে একটি বিবাহ সম্পন্ন হয়। অনেক তপশিলী (মৎস্যজীবী) পরিবারই নিজেদের সার্মথ্যের বাইরে গিয়ে ধার দেনা করে মেয়ের বিয়ে দেন। বস্তুত মেয়েদেরকে আজও তারা পরের বাড়ির বন বলেই মনে করে। তাই, তাদের লেখাপড়ার ব্যাপারে খরচ করতে তারা কণ্ঠিত; কিন্তু বিবাহ একটি সামাজিক কাজ তাই এই ব্যাপারে তারা সচেতন।

শবদাহ বিবরণ

বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়েরই একটি অংশ তপশিলী জাতি, মৎস্যজীবীরা তপশিলী গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত। হিন্দু রীতিনীতি -সংস্কারই তারা মেনে চললেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে তপশিলী জাতির শবদাহের বিবরণ উল্লেখ করা হল—

মৃত্যুর পর মৃতদেহের শেষ বারের মতো সংস্কার। এই ক্রিয়াকে "অন্তোষ্টিক্রিয়া" ও বাল হয়ে থাকে। তপসিটীদের মধ্যে কঠোরভাবে এই কাজ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তপশিলী জাতির অন্তর্ভুক্ত কিছু জাতি যেমন মৎস্যজীবী গোষ্ঠীর "তেঁতুলে বাগাদি'— এরা মৃতদেহ দাহ করে না, তারা সমাধি দেয়। এই কাজের প্রচলিত 'লৌকিক নিয়ম গুলি আলোচনা করা হল—

মৃত্যুর পর দীর্ঘক্ষণ মৃতদেহ ফেলে রাখা হয় না। নিকট আত্মীয় স্বজনদের খবর দেওয়ার পর মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়। তার জন্য বাঁশ কেটে "খাটিয়া" তৈরী করা হয়। মৃতদেহ পোড়ানোর জন্য জ্বালানী সংগ্রহ করা হয়। এরপর মৃতদেহের দুই চোখের পাতায় তুলসীপাতা দিয়ে গায়ে কোন বস্তু দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেওয়া হয়। এই সময় মৃতের দু'পায়ে আলতা লাগিয়ে কোন পরিষ্কার সাদা কাপড়ে তার ছাপ তুলে রাখা হয় সেই ব্যক্তির স্মৃতি রূপে এরপর মৃতদেহ এবং মৃতের খাটিয়া ফুল দিয়ে সাজিয়ে শশ্মানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃতব্যক্তি যদি মহিলা হন ও স্বামী জীবিত থাকে তাহলে মৃতার কপালে সিঁদুর স্পর্শ করে দেওয়া হয়, শাঁখা পলা ভেঙে ফেলা হয় এবং মৃতার হাতে একমুঠো চাল দিয়ে সেই চাল আবার রেখে দেওয়া হয়। মৃতদেহ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে সারা বাড়িতে "গোবরজল' ছিটিয়ে বাড়ি শুদ্ধ করা হয়। খাটিয়ার চারদিক ছেলে, জামাই কিংবা নাতিরা কাঁধ দিয়ে মৃতদেহ শ্মশান অবধি নিয়ে যান। শ্মশানের পথে খাটিয়াতে "আগুন মালসা" রাখা হয়। হরিনাম মুখে নিয়ে যাত্রাপথের সম্পূর্ণটা শেষ করা হয়। যাওয়ার পথে খই ও খুচরো পয়সা ছড়ানো হয়। কথিত আছে এই সময় ছড়ানো পয়সা কুড়িয়ে নিয়ে ছোট বাচ্ছাদের ঘুনসিতে ফুটো করে বেঁধে দিলে ভূত প্রেতের বাতাস লাগা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

শ্মশানে যাওয়ার পর শ্মশানে অগ্নিকর্তা স্নান করে চিতা সজ্জিত করে। অন্যদিকে মৃত বা মৃতাকে সাবান, ঘি, মধু দিয়ে গঙ্গাজল সহযোগে স্নান করানো হয়। মৃত বা মৃতার ছেলে, মেয়ে, বৌমা বা নাতি নাতনিরা এই স্নান করায়। তারপর নতুন সাদা বস্ত্র, সধবার ক্ষেত্রে লালা পাড় সাদা বস্ত্র মৃত বা মৃতাকে পরিয়ে তাকে চিতার উপর তোলা হয়। এক্ষেত্রে মৃত পুরুষ মানুষ হলে তাকে বামদিক হেলিয়ে ও মহিলার ক্ষেত্রে ডানদিক হেলিয়ে মৃত দেহকে চিতায় শোয়ানোর আগে চিতাস্থান টিকে খুব ভালো ভাবে ধুয়ে নেওয়া হয়। অগ্নিকর্তা শবদেহে আগুন ছোঁয়ায় এবং সাত বার চিতার চারদিক প্রদক্ষিণ করে। মৃতব্যক্তির ছেলেরা কিংবা নাতিরা এই আগুন ছোঁয়ানোর অধিকারী।

দাহ শেষে ১২ আঙ্গুল পরিমিত ৭টি কাঠ চিতায় দেওয়া হয়। অবশেষে অগ্নিকর্ত্তা ও দাহকারীগণ প্রত্যেকে ৭ কলসী জল চিতার দিয়ে চিতার আগুন নেভায়। শেষে মাটির কলসীতে জল ভরে তার মধ্যে পয়সা বা কড়ি দিয়ে কলসীর মুখ সরা দিয়ে বন্ধ করা হয়। অগ্নিকর্ত্তা একটি ইটের টুকরো বা অন্য কিছু হাতে রেখে সবার পিছনে কলসীর কাছে থাকে। কেউই পিছনে দেখে না, এবার অগ্নিকর্তা ছোট খোলা বা ইটের টুকরো দিয়ে কলসী ভেঙে শ্মশান ত্যাগ করে। পরে নদী বা বৃহৎ জলাশয়ে স্নানাদি করে প্রথানুসারে দেবাবশেষ নাভিস্থলটি গঙ্গার মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। এবং অন্যান্য শ্মশানযাত্রীরা গঙ্গার মাটি নিয়ে সেই নাভিস্থল পোঁতা গতের মধ্যে এক মুঠো করে গঙ্গা মাটি দেয়। এই নিয়মে "মাটি দেওয়া' বলে। এই মাটি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন জাত পাত বা পরিচিত অপরিচিতের বালাই থাকে না, বয়সে ছোট হলে যে কেউ মাটি দেয়। এখানে একটা মন্ত্র পড়া হয়—

"রাম নামে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ নামে গতি,
গোপাল গোবিন্দের নামে নাও (সমন্ধ) এক মুঠো মাটি।"

এই মাটি দেওয়ার কাজকে পুণ্যকর্ম বলে মনে করা হয়। আর শ্মশানের যারা সহযাত্রী রূপে আসে তাদের "গামুই" বলে। সব শেষে অগ্নিকর্ত্তা মাটি দেয় ও পিছন না তাকিয়ে সেই স্থান ত্যাগ করে।

শ্মশানে স্নারে পর অগ্নিকর্তা দুটি সাদা কাপড় পরিধান করে ও সাদা কাপড়ের একটি অংশ কেটে উত্তরীয়ের মতো ধারণ করে। উত্তরীয়ের মদ্যে লোহার টুকরো থাকেষ এবং হাতে ও একখানি লৌহখন্ড থাকে। এর পরবর্তী বারোদিন অগ্নিকর্ত্তা ও তার পরিবার হবিষ্যি আহার করে, দিনে একবার। রাত্রে মেঝেতে খড় পেতে শয়ন করে। পায়ে জুতো পরে না। কোন রকম স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া পরবর্তী বারো দিন ব্রহ্মচার্য পালন করে অগ্নিকর্তা ও তার পরিবার। মৃত্যুর নয় দিনের মাথায় একটি পারলৌলিকক কাজ হয় ব্রাহ্মণ দ্বারা, একে "দশা" বলে। উল্লেখ্য মৃত্যব্যক্তির মেয়ে থাকলে মেয়েরা তিনদিন ব্রহ্মচর্য পালন করে বাবা কিংবা মায়ের শ্রাদ্ধ করে। এরপর থেকে তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করে। অন্য

দিকে ছেলেরা ও তাদের পরিবার বারোদিন পর "ঘাট" (পুকুর ঘাটে ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্রাদি পাট করে পারলৌকিক কাজ) ও তেরোদিন পর শ্রাদ্ধ করে। ব্রাহ্মন নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়ে থাকে। যযমান নিজ সার্মথ্য অনুযায়ী "তিলজল" বা "ষাড়শ" শ্রাদ্ধ করে থাকে। এই দিনের পর থেকে অগ্নিকর্ত্তা, পরিবারের অন্যান্যরা অশৌচ ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। তবে এই পরদিন অর্থাৎ শ্রাদ্ধের পরদিন "নিয়মভঙ্গের" অনুষ্ঠান। এটি একটি সামাজিক কাজ। এই কাজে সমাজ, পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন সবাই আসে। এবং সেই বাড়িতে মধাহ্নভোজ সারে। আগতরা অবশ্যই আমন্ত্রিত হন। এবং অগ্নিকর্তা ও তার পরিবারের জন্য নতুন বস্ত্র নিয়ে আসেন। এই কাজের পর স্বাভাবিক জীবন যাপন শুরু হলেও অগ্নিকর্তা আগামী একবছর কোন শুভ কাজ এমনকি কোন পূজো ও করতে পারেন না। এই সময়ে কালাশৌচ চলে, একবছর পর আবার ব্রাহ্মণ দ্বারা অশৌচ নিবারনের পর তারা স্বাভাবিক হতে পারে।

এইরূপ জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু এই তিন কাজেই তপশিলী (মৎস্যজীবী) সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক নিয়ম নীতি ও আচার অনুষ্ঠান বহুকাল ধরে চলে আসছে।

সামাজিক বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ধর্মীয় বিভিন্ন নিয়ম নীতি অনুষ্ঠান এই সমাজে প্রচলিত সেই গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক—এই সম্প্রদায়ের মানুষজন ভীষণভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসী। তাই বারো মাসই তারা বিভিন্ন পূজার্চনা ও আচার পালন করে থাকে। নববর্ষের দিন থেকেই এই পালন শুরু হয় আর শেষ হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে। জৈষ্ঠ্য মাসের প্রতি মঙ্গলবার মা মঙ্গলচন্ডীর ব্রত পালিত হয়, আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী, বিপত্তারিনী ব্রত, শ্রাবণ মাসে প্রতি শনিবার পালিত হয় বড় বাবা অর্থাৎ শনিদেবতার পূজা। ভাদ্রমাসে পালন করে জন্মাষ্টমী পূজো। ভাদ্র মাসের শেষে ঘটা করে পালন হয় রান্নাপূজো। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজো, লক্ষ্মীপূজো, কার্তিক মাসে কার্তিক পূজো ও কার্তিক মাস জুড়ে দামোদর ব্রত পালন করে। অগ্রহায়ণ মাসে পালন হয় "বারিঘট পূজো"। পৌর্ষে পৌষ সংক্রান্তি অর্থাৎ পিঠে পুলির আয়োজন হয়। মাসের শুরুতেই গঙ্গার স্নান পালন করে এই সমাজ। ফাল্গুনে দোল এবং চৈত্রে ঝাঁপ। এছাড়া গঙ্গাপূজো, মনসা পূজো, গাজীপীরের পূজো এগুলিতে তপশিলী সম্প্রদায়ের অন্তভুক্ত মৎস্যজীবীদের অন্যতম প্রধান পূজো। এছাড়া অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশী এসব পালন তো আছেই।

তপশিলী তথা মৎস্যজীবী সম্প্রদায় সমাজে অনুন্নত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। নানান অসুবিধা, সমস্যা প্রতিবন্ধতা অতিক্রম করেও আজও তারা জীবন সংগ্রামে এগিয়ে চলেছে। তাদের সমাজে প্রচলিত নানান সংস্কার আচার, নিয়ম, অনুষ্ঠান নিয়ে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল যা তাদের মধ্যে পৃথক সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে।"

তথ্য নির্দেশ—

১. ঘোষ প্রদ্যোত ; 'বাংলার জনজাতি' (পৃ ঃ ২০৪-২০৫)। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৭; অনুপকুমার মহিন্দার পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯